শনিবার, ১৫ আষাঢ়, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৮৩

বিমান ভেঙে পড়ার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই

মুম্বইয়ের ঘাটকোপাড়ে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় যেভাবে একটি বিমান ভেঙে পড়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। ওই এলাকায় জাগৃতি বিল্ডিং নামে একটি বহুতলের ছাদের উপর ভেঙে পড়ে বিমানটি। এই ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিমানটিতে আগুন লেগে যায়। বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ বিটি-ইউপিজেড, কিং এয়ার সি-৯০ চার্টার্ড বিমানটি মুম্বই বিমানবন্দর থেকে রওনা হয়ে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে ঘাটকোপাড়ে সর্বদানগরের ওই বহুতলের উপর ভেঙে পড়ে। ১২ আসন বিশিষ্ট ওই বিমানটিতে সে সময় যাত্রা করছিলেন চারজন বিমানযাত্রী। ভয়াবহ আগুন থামাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। একটি সূত্রের দাবি অনুযায়ী, এই বিমান আগে উত্তর প্রদেশ সরকারের মালিকানাধীন ছিল। বর্তমানে এটি মুম্বইয়ের কোম্পানি ইউআই অ্যাভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং গুটখা ব্যারন দীপক কোঠারির অধীনে ছিল।

মুম্বইয়ের জনবসতি পূর্ণ এলাকায় বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় গোটা এলাকায় তুমুল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। চারদিক কালো ধোঁয়ায় ভরে যায়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে মুম্বই বিমানবন্দর মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে। কীভাবে এই চার্টার্ড বিমানটি অকস্মাৎ ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ভেঙে পড়ল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। স্থানীয় জনসাধারণের অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে শুধু পুলিশি তদন্তই যথেষ্ট নয়, চাই পূর্ণাঙ্গ তদন্ত।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (সুরেন্দ্রের প্রতি)—মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলতো, ঘটি রোজ মাজতে হয়; তা না হলে কলঙ্ক বড়বে। সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার।

“সন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ; তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমরা মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে ত্যাগ করবে।”

“**বীর ভক্ত** না হলে দু দিক রাখতে পারে না; জনক রাজা সাধন ভজনের পর সিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে দুখানা তলোয়ার ঘুরাতো; জ্ঞান আর কর্ম।”

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন—

এই সংসার মজার কুটি।
আমি খাই দাই আর মজা লুটি।।
জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসে ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি।।

“তোমাদের পক্ষে চৈতন্যদেব যা বলেছিলেন, জীবে দয়া, ভক্তসেবা আর নাম সংকীর্তন।”

“তোমায় বলছি কেন? তোমার হৌস-এর (House, সদাগরের বাড়ির) কাজ; আর অনেক কাজ করতে হয়। তাই বলছি।”

“তুমি অফিসে মিথ্যা কথা কও তবে তোমার জিনিষ খাই কেন? তোমার যে দান ধ্যান আছে; তোমার যে আয় তার চেয়ে বেশি দান কর; বারো হাত কাঁকুরের তের হাত বিচি!”

“কৃপণের জিনিষ খাই না। তাদের ধন এই কয় রকমে উরে যায়ঃ ১ম ঃ- মামলায় মোকদ্দমায়; ২য় ঃ- চোর ডাকাতে; ৩য় ঃ- ডাক্তার খরচে; ৪র্থ ঃ- আবার বদ ছেলেরা সেই সব টাকা উড়িয়ে দেয়; এই সব।”

“তুমি যে দান ধ্যান কর, কর খুব ভালো। যাদের টাকা আছে তাদের দান কার উচিত। কৃপণের মন উড়ে যায়। কৃপণের ধন উরে যায়, দাতার ধন রক্ষা করা হয়, সৎকাজে যায়। ও-দেশে চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এতো তোড় হয় যে খেতের আল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেড়িয়ে যায় ও নষ্ট হয়। তাই চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছেঁদা করে রাখে, তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ দিয়ে একটু একটু বেড়িয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না। আর ক্ষেতের উপর পলি পরে। সেই পলিতে ক্ষেত উর্বরা হয়; আর খুব ফসল হয়। যে দান ধ্যান করে, সে অনেক ফল লাভ করে; চতুর্বর্গ ফল।”

ভক্তেরা সকলে ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে এই দান-ধর্ম কথা এক মনে শুনিতেছেন।

সুরেন্দ্র—আমার ধ্যান ভালো হয় না। মাঝে মাঝে মা মা বলি; আর শোবার সময় মা মা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পরি।

দিনপঞ্জিকা

১৫ আষাঢ়, ভাঃ ৯ আষাঢ়, **৩০ জুন**, ১৫ আহার, সংবৎ ২ আষাঢ় বদি, ১৫ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৮, সূর্য্যাস্তি ঘ ৬।২৪। **শনিবার**, দ্বিতীয়া দিবা ঘ ১।২২ মিঃ। উত্তরাষাঢ়নক্ষত্র অপরাহ্ণ ঘ ৫।২১ মিঃ। বৈধৃতিযোগ শেষরাত্রি ঘ ৪।১১ মিঃ। গরকররণ, দিবা ঘ ১।২২ গতে বণিজকরণ, রাত্রি ঘ ২।২১ গতে বিষ্টিকরণ। **জন্মে**— মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শুদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, অপরাহ্ণ ঘ ৫।২১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**— চতুষ্পাদদোষ, দিবা ঘ ১।২২ গতে ত্রিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।২১ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**— উত্তরে, দিবা ঘ ১।২২ গতে অগ্নিকোণে। **কালবেলাদি** ঘ ৬।২৯ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।২ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৪ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৪।৫৯ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম্ম**— নাই। **বিবিধ**— দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং তৃতীয়ার সপিণ্ডন। **মাহেন্দ্রযোগ**— দিবা ঘ ৫।৫৬ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৩।৪২ গতে ৬।২৪ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৪।৫৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৫ আষাঢ়, ভাঃ ৯ আষাঢ়, **৩০ জুন**, ১৫ শওয়াল, ১৫ আহাব, উঃ ৪।৫৭, অঃ ৬।২২, শনিবার, দ্বিতীয়া দি ঘ ১/২১, সেহ্‌রী শেষ ৩/২২, ইফতার ৬/৩০।

মাদককে ‘না’ বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

“প্রেম নেই” লেখায় গৌরকিশোর ঘোষকে সাহায্য করেছিলাম

সেখ হাসান ইমাম
শেষ পর্ব

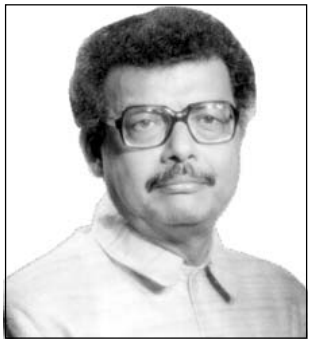

উল্লিখিত পত্রের উত্তরে লিখিত আমার পত্রখানিকে তিনি তারিখবিহীন বলে উল্লেখ করেছেন তার ৩১/১২/৭৭ তারিখের পত্রে। তিনি লিখেছেন, পুরো ডিসেম্বর মাসটাই তিনি আমার অপেক্ষায় বাড়িতে কাটিয়েছেন। ‘ডিসেম্বরে যেতে পারি’ বলা সত্বেও যাওয়া হয়নি। এখন কেউ কৌতুহল প্রকাশ করতে পারেন, গৌরকিশোর ঘোষের মতো সাংবাদিক সাহিত্যিকের আমন্ত্রণ পেয়েও ‘যেতে পারি’ বলেও আমি কেন যাইনি। বলতে দ্বিধা নেই, সেই সময় আমি কিছুটা হীনমন্যতায় ভুগছিলাম। পত্রালাপে পরিষ্কার, গৌরবাবু আমার সম্পর্কে মোটামুটি একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করছিলেন, অন্তত তাঁর প্রয়োজন মেটার নিরিখে। যে দেশে বৃক্ষ নেই, ভেরান্ডা বড় বৃক্ষ—সেই সুবাদে অজ পাড়াগাঁয়ে নিজের সুলালিত অহং হিমালয় সদৃশ শ্রীঘোষের সামনে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে পারি এই আশঙ্কা আমাকে বিঁধছিল কাঁটার মতো। তাই এড়িয়ে গেছি এই ভেবে যে, তাড়াতাড়ি করার কী আছে। ওঁর ‘প্রেম নেই’ শেষ হোক, উনিও হাল্কা হোন, তারপর একদিন যাওয়া যাবে সহজভাবে। এই চিঠিতেও তিনি স্বীকার করেন যে, আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর উপন্যাসের নায়কের এক অদ্ভুত মিল তাঁর কাছে ধরা পড়েছে।

সি-ত, এম-আই-জি হাউসিং এস্টেট, ৬০/৬৭ বি.টি. রোড, কলকাতা ৭০০০০২

প্রিয় হাসান, তোমার তারিখবিহীন পত্রখানি গতকাল পাইয়া বড়ো ভালোলাগিল। ডিসেম্বরে তুমি আসতে পার, এই আশায় পুরো মাসটি বাড়িতেই ছিলাম। আগামী পরশুই ঠাকুরপুকুরের নিকটে একটি গ্রামে চলিয়া যাইব। এই গ্রামটিতে কিছু মুসলমান পরিবার আছে, যাহাদের পরামর্শ আমার খুব কাজে লাগে। তোমার সহিত ঘটনাক্রমে পরিচয়লাভ আমার পক্ষে যে কত ভালো হইয়াছে, কী বলিব। এখন, যখনই প্রশ্ন জাগে, মনে হয়, আহা হাসান হাতের কাছে থাকিলে বড়ো ভালো হইত। চিঠি লিখিলে জবাব পাওয়া যায়। কিন্তু কাছে থাকিলে বড়ো ভালো হইত। কাছে থাকিলে কথার পিঠে যে কথা ওঠে তাহা সঙ্গে সঙ্গে মেলে। আমি জানি ‘প্রেম নেই’ লিখিতে বসা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মূল দিকটির আজও সমাধান হয় নাই। দেশভাগ হইল। কিন্তু সমস্যা যাহা তাহা রহিয়াই গেল। হিন্দু-বাঙালি সম্পর্কে মুসলমান-বাঙালির অথবা মুসলমান প্রতিবেশী সম্পর্কে হিন্দু প্রতিবেশীর হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হইল না। এই তিক্ত সত্যটির প্রতি সংবেদনশীল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলেই নিজেকে সার্থক মনে করিব। আমি ঠাকুরপুকুরে প্রায় একমাস থাকিব এবং ১ ফেব্রুয়ারি এখানে যোগ দিব। তোমার এবং ফটিকের অভিজ্ঞতা যে কী পরিমাণ ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি নিজে আবাক হইয়া পড়িতেছি। ভালবাসা জানিও।

গৌরকিশোর ঘোষ

এর মধ্যে দুমাস কেটে গেছে। এই চিঠিটি বক্তব্যে এবং চরিত্রে তার পূর্বসূরীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে প্রশ্ন আছে আমার ব্যক্তিগত ভালোমন্দ নিয়ে, প্রশ্ন নেই ‘প্রেম নেই’ এর জন্যে। তবে আমাকে ঘিরে তাঁর উদ্বেগ চিঠির ছত্রে ছত্রে।

কলকাতা ১২ মার্চ ৭৮

স্নেহের হাসান,

তোমার কী হইয়াছে? পত্রপাঠ জানাও। তোমার জন্য উদ্বিগ্ন। তোমার এবং বাসার সকলে কুশল তো? আমার পত্র কি তুমি পাও নাই? আমি বর্তমানে ‘প্রেম নেই’ শেষ করিতে ব্যস্ত। এ পর্যন্ত তোমার যাহা মনে হইয়াছে, অকপটে যদি জানাও, খুশি হইব। ভালোবাসা জানিবে। কল্যাণার্থী,

গৌরকিশোর ঘোষ

গৌরদার উল্লিখিত চিঠির উত্তর আমি যথা সময়ে দিয়েছিলাম। আমাকে লেখা তাঁর শেষ চিঠি ৭নং পোস্টকার্ড এল বেশ দেরিতে। কারণটাও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি সেখানে

৩১/৫৭৮

স্নেহাস্পদেষু হাসান,

তোমার পত্র যথা সময়েই পাইয়াছি। ‘প্রেম নেই’ শেষ করিতে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া উত্তর দিতে পারি নাই। এই সংখ্যার ‘দেশ’-এ শেষ কিস্তি পড়িতে পাইবে। ১৯৫৪ সালে ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ লিখিতে শুরু করি। উহার পূনর্মুদ্রণ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকদিনের ব্যবধানে ‘প্রেম নেই’ রচনা সমাপ্ত হইল। এই কয় বৎসর মুসলমান সমাজকে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। পারিয়াছি এমন দাবি করি না। তবুও বলি, ভালো হউক, মন্দ হউক, ‘প্রেম নেই’ আমার নিকট জাতি বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্টারই ফল বা ফসল। মুসলমান সমাজ যে আমার পাশেই রহিয়াছে, দেশ পত্রিকার পাঠকেরা সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবহিত হইয়াছেন। ইহাতেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেছি। আমার কাজ এইখানেই শেষ হইল। শরীরের যা অবস্থা তাহাতে ‘দেশ-মাটি-মানুষের’ তৃতীয় খন্ড ‘প্রতিবেশী’ যদি শেষ করিতে পারি, তবে তাহা ভাগ্য। আমাকে জুন মাসের মাঝামাঝি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যাইতে হইতেছে। চার সপ্তাহ পরে ফিরিব। এখন তোমার নিকট আমার একটা জিনিস চাহিবার আছে। তাহা এই ‘প্রেম নেই’-এর বিস্তারিত আলোচনা অর্থাৎ তোমার অকপট মত। প্রথমেই লিখিবে কোথায় তোমার অবাস্তব মনে হইয়াছে এবং কোথায় মুসলমান চরিত্র মুসলমান হইয়া উঠে নাই। তুমি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ১,২,৩ করিয়া তাহা আমাকে ধরাইয়া দিবে। আমি বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া ‘প্রেম নেই’ এর মেরামতে হাত দিব। তৎপূর্বে তোমাদের অকুণ্ঠ মতামত প্রয়োজন। আমার ভালোবাসা জানিবে।

কল্যানার্থী গৌরদা

‘প্রেম নেই’ সম্পর্কে আমি আমার অকপট মতামতই জানিয়েছিলাম। তিনি কীভাবে তা নিয়েছিলেন আমি জানতে পারিনি। তাঁর ৭টি চিঠির প্রত্যুত্তরে আমি কী কী লিখেছিলাম, তা তুলে ধরার অবকাশ এখানে নেই। তবে তা যে তাঁকে খুশি করেছিল, সতর্ক পাঠক তাঁর চিঠিগুলি পড়েই তা বুঝতে পারছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হল, এরপর দু’দশকের অধিককাল তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে আমার কোনও পত্রালাপ হয়নি। আমিও কোনও যোগাযোগের চেষ্টা করিনি, এটা তো ঠিক। কারণটা উল্লেখ না করলেও চলে, তবে সত্যান্বেষী গৌরকিশোর ঘোষের স্মৃতি চারণায় সত্য গোপন করতে বিবেকে বাঁধছে। ১৯৯১ সালে তার ‘প্রেম নেই’ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। একটি কপি কিনলাম স্কুলের লাইব্রেরীর জন্যে। স্বাভাবিক কৌতুহল বশেই চোখ বুলালাম ভূমিকা অংশে। সত্যকে স্বীকার করলে বলতে হয়, আশাহত হলাম। যাদের কাছে উনি সহযোগিতা পেয়েছেন, এমন কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমার সহযোগিতা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য নয়, মনকে সান্ত্বনা দিলাম। যাই হোক, হঠাৎই দেখা হয়ে গেল অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। আশির দশকে হরফ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী সাহিত্যিক আব্দুল আজিজ আল-আমান কলেজ স্ট্রীটে নিয়মিত সাহিত্যসভার আয়োজন করতেন তাঁর সম্প্রদনায় সাহিত্যমাসিক কাদেলাকে উপলক্ষ্য করে। তারই সুবাদে মাঝে মাঝে হাজির হতাম ঐ মজলিসে মাসের শেষ রবিবারে। ১৯৮২ সালে এমনি একটি সভায় অংশ নিতে গিয়ে শুনলাম কাদেলার পক্ষ থেকে ঐদিন ‘প্রেম নেই’ উপন্যাসের লেখক গৌরকিশোর ঘোষকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। যথাসময়ে গৌরবাবু হাজির হলেন স্ত্রী ও কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে। আমি সেদিনই তাঁকে দেখলাম। আর তার তো আমাকে চেনার কোনও প্রশ্নই নেই। আব্দুল আজিজ আল আমান সাহেব আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি লেখকের সঙ্গে আমার পত্রালাপ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বললাম। বক্তব্য শেষ করে বসলাম। একটু দূরত্ব বজায় রেখেই। সভা শেষ হলে গৌরবাবু, ইশারায় আমাকে কাছে ডাকলেন। ভালোমন্দ জিজ্ঞাসা করলেন। আমার তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। আমার কিন্তু যাওয়া হয়নি ওঁর ওখানে। আর কোনও যোগযোগও হয়নি। তাতে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। আর তার জন্যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা একটুকুও কমেনি। তিনি এই মরজগতের বাঁধন ছিঁড়ে অমরলোকে যাত্রা করেছেন। এই নশ্বর জগতে তাঁর কীর্তি অবিনশ্বরতার প্রান্ত সীমা স্পর্শ করেছে। নেতাজির একটি বাণী মনের গভীরে অনুরণিত হচ্ছে, ‘......এই নশ্বর জগতে সব কিছুই ধ্বংস হবে। কেবল বিলুপ্তি ঘটবে না ভাব, আদর্শ আর স্বপ্নের।’ জীবনশিল্পী গৌরকিশোর ঘোষ মহাশয় মহৎভাব এবং আদর্শের প্রচারে জীবনপাত করেছেন। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী।

স্মরণে হুল দিবস

ড: প্রসেনজিৎ সরকার

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকারের আমলে ব্রিটিশবিরোধী যে কয়েকটি উপজাতি বিদ্রোহ হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। অন্যান্য সমস্ত উপজাতিভিত্তিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তৎকালীন বাংলায় বসবাসকারী সাঁওতালরা ছিল সরল জীবনযাপনকারী একটি গোষ্ঠী, অত্যন্ত শান্তপ্রিয় সম্প্রদায়ের মানুষ। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কৃত অযাচিত কিছু ঘটনা তাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে নেমে আসে এবং তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই দিনটি ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিবস, যা হুল দিবস নামে পরিচিত। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা আগে প্রয়োজন, তা হল ১৮৫৫ সালের বিদ্রোহের আগেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল প্রতিরোধ দেখা গিয়েছিল। ১৭৮০ সালে তিলকা মুর্মু-র নেতৃত্বে সাঁওতালরা গণসংগ্রামে অংশ নেয়। ইনি তিলকা মাঞ্জহী নামেও পরিচিত ছিলেন। সর্বপ্রথম সাঁওতাল মুক্তিবাহিনী গঠন করেন। ১৭৮৪ সালে তাঁর তিরের আঘাতে ক্লিভল্যাণ্ড প্রাণ হারান ও ১৭৮৫ সালে তাঁর ফাঁসি হয়। পরবর্তী সময়ে ১৮১১, ১৮২০ এবং ১৮৩১ সালেও নানা কারণে সাঁওতালরা গণসংগ্রামে অংশ নিয়েছিল।

১৮৫৫ সালের বিদ্রোহ বা সাঁওতাল হুল-এর সূচনা হয় বাংলার মুর্শিদাবাদ ও বিহারের ভাগলপুরে। বিদ্রোহের আগে এখানে চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্তের প্রবর্তনের ফলে সাঁওতালদের উপর ব্রিটিশ ও জমিদারদের অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল, ফলে তাদের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যই এবং স্বাধীন সার্বভৌম সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাঁওতালরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য বিদ্রোহের পিছনে আরও নানা কারণ মজুত ছিল, ১) সাঁওতালদের জমিতে তাদেরকেই কৃতদাস হিসাবে কাজে লাগানো হতো। ২) সাঁওতালদের সম্পত্তি জবরদখল ও আত্মসাৎ করা হতো। ৩) তাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার উপর আঘাত করা হতো। ৪) তাদেরকে ঋণগ্রস্ত করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হতো। ৫) সাঁওতাল রমণীদের সম্মানহানি করা প্রভৃতি।

অবশেষে সাঁওতালদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং তারা শোষনহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সিধু, কানু, চান্দ, ভৈরব প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন ৩০ হাজারের বেশি সাঁওতাল ভাসনাডিহির মাঠে সমাবেশ করে এবং কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করে। এটাই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম গণযাত্রা। এই সময় কিছু সাঁওতাল নেতাকে গ্রেফতার করা হলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহীরা সাঁচকাধিয়া নামক স্থানে মহাজন কেনারাম ভকত সহ ১৯ জনকে হত্যা করে। সরকারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কামার, কুমোর, ডোম, তেলি, গরিব, মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের মানুষ এতে যোগদান করে। এটি স্বভাবতই একটি গণসংগ্রামের রূপ নেয়। ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। বিভিন্ন রেজিমেন্ট বাহিনী নিয়োজিত হয়। সাঁওতাল নেতাদের ধরিয়ে দেবার পুরস্কারস্বরূপ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়। অক্টোবর মাসে সরকার সিধু-কানুর বিরুদ্ধে ‘অস্ত্র সামরিক আইন’ জারি করে। যদিও ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে এটি প্রত্যাহার করা হয়। শেষ পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট যোগানের রেঞ্জার্স বাহিনীর হাতে সাঁওতালদের পরাজয় ঘটে। বিদ্রোহের অবসান হয়। ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কানুকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সিধু অবশ্য লড়াইয়ের আগেই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, এই বিদ্রোহে নারীরাও সমানভাবে অংশ নেন এবং সিধু, কানুর বোন ফুলমণির ক্ষতবিক্ষত দেহ রেললাইনের ধারে পাওয়া যায়। চান্দ, ভৈরব ও ভাগলপুরের কাছে এক যুদ্ধে প্রাণ হারান। কালিয়ান হরান এই বিদ্রোহে সাঁওতালদের গুরু ছিলেন এবং এই বিদ্রোহের লিপিকারও ছিলেন। তিনি ‘হরকোরেন মারে হাপরাম্বো রিয়াক কথা’ — নামক রচনায় লিখেছেন বিদ্রোহে সাঁওতালদের ধ্বনি ছিল— ১) রাজা-মহারাজাদের খতম করো। ২) ফিকুদের (মহাজনদের) গঙ্গাপার করে দাও প্রভৃতি। এই বিদ্রোহের ফলে শেষ পর্যন্ত সাঁওতালদের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং ডুমকা জেলায় সাঁওতাল পরগনা গঠিত হয়। সেখানে শুধুমাত্র সাঁওতালী আইন চালু হয়। এভাবেই বিদ্রোহের সম্মান জানাতে, সাঁওতালদের এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ নানা রাজ্য সরকার ৩০ জুন দিনটিকে হুল দিবস হিসাবে পালন করে। তাদের এই বীরত্ব গাথা আমাদের মনে চিরকাল চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সম্পাদক সমীপেষু

পরিবেশ রক্ষায় জৈব কৃষি গুরুত্বপূর্ণ

বর্তমানে কৃষি পদ্ধতি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন। একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও তার চাহিদাভিত্তিক খাদ্যের জোগান, অন্যদিকে স্বাস্থ্যের তথা উর্বরতার অবক্ষয়। জৈব কৃষি পদ্ধতি আমাদের দেশের একান্তই নিজস্ব। গোটা ভূখণ্ডে জৈব কৃষি পদ্ধতির পুরোধা ভারতবর্ষ। এই কৃষিপদ্ধতি পরিবেশবান্ধবও। বিষমুক্ত ফসল পেতে জৈব চাষে গুরুত্ব দিতে হবে। সুযোগ বা সম্ভাবনা কম নেই। কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে চাষ হলেও সংগঠিত ক্ষেত্রে এই রাজ্য বেশ পিছিয়ে। পাশের রাজ্য সিকিম সেই তুলনায় অনেক এগিয়ে। কৃষিকাজে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করতে গিয়ে রাসায়নিক সারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে জমি তার উর্বরতা হারাচ্ছে। তার সাথেই পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। ভূ-গর্ভস্থ জলে পাওয়া যাচ্ছে রাসায়নিক সারের অংশ বিশেষ, যেমন নাইট্রেট যা ডেকে আনছে দুরারোগ্য ব্যাধি। জৈব চাষে সরকার যতই উৎসাহ দিক না কেন, নির্ভরশীল রাসায়নিক সার ছেড়ে চাষিরা চট করে জৈবচাষে আসতে চান না। এর ফলেই কীটনাশক খাবারের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ঢুকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ নির্বিচারে কীটপতঙ্গ ধ্বংস হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে জীব বৈচিত্র্য। কিন্তু জৈব চাষে স্বল্প মেয়াদি কিছু সমস্যা থাকলেও দীর্ঘ মেয়াদে প্রভূত উপকার আছে। অনেকটা ফ্লাইওভার তৈরির সময়ের দেওয়া স্লোগানের মতো, “টু ডেজ পেন টুমরোজ গেন”। জৈবচাষে জমিতে জল ধারণের ক্ষমতা বাড়ে, বাড়ে ফলনও। স্বাদেও অতুলনীয়। দামও ভালো পাওয়া যায়। রয়েছে চাহিদা সরকারি স্তরে কর্মসূচি নেওয়া হলেও সদিচ্ছার অভাব দেখা দিচ্ছে। খাদ্যের নিরাপত্তার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ করছে। এবার নিরাপদ খাদ্যের ব্যাপারে ক্রেতা ও উৎপাদকদের সচেতন হতে হবে। সর্বোপরি আমাদের এই সুন্দর ধরিত্রিকে বাঁচাতে গেলে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে খাদ্য সুরক্ষারকে বজায় রাখতে অবিলম্বে জৈব কৃষিকে প্রাধান্য দেওয়া হোক।

সৈকত রানা, কলকাতা-৩৭

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য ‘আর্থিক লিপি’ কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়